ان الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ونستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

মুসলিম উম্মাহ দিন দিন নানা প্রকারের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চলেছে। সময়ের গতির সাথে সেটা বেড়েই চলেছে। এই ব্যাধিগুলোর কোন কোনটি আবার শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে গিয়ে দ্বীনি ব্যাপারগুলোতেও সংক্রমিত হচ্ছে। এই রকম নানাবিধ ব্যাধির ছড়াছড়ি সত্ত্বেও উম্মাহর বেশ কিছু চমৎকার দিক সর্বদা দৃশ্যমান। এটা প্রথমত আল্লাহ তায়ালার রহমত অতপর তার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহর উপস্থিতি এবং সালেহ বান্দাদের দোয়া এবং ইস্তেগফারের কল্যাণের ফষল। وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ভয়ানক যে ব্যাধিটি উম্মাহকে ধরাশায়ি করে রেখেছে, তা হলো ইখতিলাফ। ইখতিলাফ উম্মাহর অনেকগুলো ব্যাপার যেমন আক্বিদা, মানহাজ, মোয়ামেলাত এবং চরিত্র ইত্যাদিতে বিস্তৃত।

আল্লাহ প্রদত্ত এ শরিয়তের দিকে একটু ভাল করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, তাওহীদের পর সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেটা হল মতৈক্য এবং সংঘবদ্ধতা। ইসলাম সময়ের সাথে চলমান বা গতিশীল জীবন ব্যাবস্থা। মানুষকে তার অবস্থার (স্থান, কাল , পাত্র) আলোকে মূল্যায়ন করে। আর আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, সবজান্তা এবং সূক্ষদর্শি; তিনিই আসল ব্যাপারটা ভাল জানেন। ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের বিচিত্র রকমের বিবেচনাবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা তাদের বিভিন্ন বিষয়কে মূল্যায়ন এবং পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের দিকে নিয়ে যায়। আর এ জন্যই ইসলাম বেশ সংখ্যক ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে। যতক্ষণ না এই মতপার্থক্য উম্মাহর ঐক্যের জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায়।

ইসলামে মতপার্থকের ধারণাই হলো মৌলিক বিষয় এবং নীতিতে একাত্ম হওয়া যথেষ্ট। আর ছোট খাট বা শাখা পর্যায়ের ব্যাপারগুলোতে মতপার্থক্য করা, সর্বোত্তম মত বা কোন একটি বিশেষ মতের দিকে ঝুকে পড়ার সুযোগ আছে। তবে এ সব ক্ষেত্রে ইখতেলাফের কিছু নিয়ম-কানুন এবং আদব-কায়দা রয়েছে। আমরা এই আলোচনায় এখতেলাফের হাকিকত, কখন এখতেলাফ নিষেধ, এখতেলাফের আদব কি? ইত্যাদি নিয়ে আসার প্রয়াস পাব। আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের এই আলোচনা হৃদয়াঙ্গম করা এবং তা থেকে উপকৃত হবার তৌফিক দান করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং দোয়া কবুলে সক্ষম। আর সালাত, সালাম আমাদের নবী (স) এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি।

## আদাবুল ইখতেলাফ:

সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা বা বাতিলকে বাতিল বলে গণ্য জন্য পরস্পর বিরোধী পক্ষগুলোর মাঝে চলমান মতভেদই **ইখতেলাফ**।

ইখতেলাফের প্রকারভেদ:

ইখতেলাফকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পরস্পর বিরোধী মতপার্থক্য

২. একপাক্ষিক বিরোধীতা

৩. উপলব্ধিগত মতপার্থক্য

**১. পরস্পর বিরোধী মতপার্থক্য :** এটা হল প্রতিটি পক্ষই যা প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে তারা তার সবটুকু বা কিছু অংশে সঠিক। কিন্তু প্রতিপক্ষের বিরোধীতা করতে গিয়ে ভুল করছে। এই প্রকারের ইখতিলাফ একবাক্যে হারাম। বর্তমান সময়ে ইসলামী জামায়াতগুলোর মাঝে বিরাজমান অধিকাংশ ইখতেলাফ এই প্রকারের।

এ ক্ষেত্রে কখনো দুটি পক্ষই নিন্দনীয়। যেমন আল-াহ তায়ালার বাণী:

و لا يزالون مختلفون* الا من رحم ربك

আয়াতে আল্লাহ রহমত প্রাপ্তদের ইখতিলাফকারীদের দল থেকে পৃথক করেছেন। তার অন্য একটি আয়াতে এসেছে : ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَـٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ

তার আরেকটি বাণী : وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ

অন্য আয়াতে এসেছে

অনুরূপভাবে নবী (স) যখন তার উম্মতের ব্যাপারে বলছিলেন যে, আমার উম্মত তিয়াত্তরটি ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি বলেছেন: তাদের প্রত্যেকটিই জাহান্নামী। শুধু একটি ব্যাতীত। তারাই হল আল-জামায়াহ। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে: "যে আমি এবং আমার সাহাবীদের  চলা পথের উপর অটল থাকবে।" তার বর্ণণা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে; সব পক্ষের মতপার্থক্যকারীরাই ধ্বংসশীল। শুধু একটি পক্ষ ব্যতীত। আর তারা হল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ।

কখনো শুধু একটি পক্ষের কর্ম নিন্দনীয় হবে। এটা হল একপাক্ষিক মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে। যখন কোন একটা পক্ষ দাবী করবে তারা নিজেরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিপক্ষ বাতিলের উপর। আর অন্য পক্ষের দাবী হবে : না; আমাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে ঠিকই। কিন্তু আমরা দুটি পক্ষই মৌলিকভাবে সত্যের উপর দাড়িয়ে। এ অবস্থায় শুধু প্রথম পক্ষের কর্ম নিন্দনীয়; দ্বিতীয় পক্ষের নয়।

**২.  ধরণগত ইখতেলাফ :** এ প্রকারের ইখতেলাফ বিভিন্ন ধরণের হয়। তারমধ্যে যেমন; দুপক্ষের কথা বা কাজের উভয়টিই শরিয়ত সম্মত হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ কিরাআতের ব্যাপারে সাহাবাদের মতপার্থক্যের বিষয়টি নিয়ে আসা যায়। তাদের মতপার্থক্যের কারণ শোনার পর রাসূল (স) তাদের দুজনকেই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলেন : "তোমাদের দুজনই মুহসিন।"

একই রকম ইখতেলাফ বিভিন্ন বিষয়ে হয়েছে। যেমন আযান, ইকামত, ইস্তিফতা, তাশাহুদ, সালাতুল খওফ, দুই ইদের তাকবীর এবং জানাযার তাকবীর সমূহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। যার কোনটিই শরিয়তে অসমর্থিত নয়। যদিও অনেকে বলেন, এটার চেয়ে এটা বেশি ভাল। তবে যদি কোন পক্ষ প্রতিপক্ষের মতকে বাতিল  ঘোষণা করেন তখন ধরণগত বৈধ মতপার্থক্যটা পরস্পর বিরোধীতার অবৈধ মতপার্থক্যে রূপ নেয়।

এ ক্ষেত্রে পক্ষগুলো যদি একে অপরকে দোষারোপ না করে; তখন তারা ইসলাম অনুশীলনের উঁচু একটি জায়গায় অবস্থান করছে। কোরআন তাদের দু'পক্ষেরই প্রশংসা করেছে :

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قأمة علي~ أصولها فبِذن الله

**৩. উপলব্ধির পার্থক্য:** আর এটা হলো মতবিরোধকারী প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোরআন-হাদীসের ভাষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যায় বুঝা। তবে শর্ত হল ওই আয়াত বা হাদীস সেই ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখতে হবে। বেশ ক'টা উদাহরণ টানলে এটা স্পষ্ট বুঝা যাবে।

**এক:** একদা (খায়বার অবরোধের সময়) রাসূল (স) সাহাবীদের বললেন: "তোমরা যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ইমান রাখ, অবশ্যয় বনি কুরায়যায় গিয়ে আছরের সালাত আদায় করবে।" সাহাবীরা রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত বনি কুরায়যার দিকে যাচ্ছিলেন। আসরের সময় শেষ হয়ে আসছিল। সাহাবীরা আসরের সালাত আদায় করা নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন। যারা মনে করেছিলেন রাসূল (স) মূলত দ্রুত পৌছার আদেশ দিয়েছেন তারা পথেই সালাত আদায় করে নিলেন। আরেকদল সাহাবী বনি কোরায়যায় পৌঁছার পর সালাত আদায় করেন। তাদের যুক্তি ছিল রাসূলের সরাসরি আদেশ বনি কোরায়যায় পৌঁছে সালাত আদায় করার। পরে রাসূল (স) এর কাছে বিষয়টা উপস্থাপন করা হলে তিনি তাদের দুপক্ষের কর্মকেই সমর্থন করেন। কোন পক্ষকেই নিন্দা করেননি।

দুই: আল্লাহ তায়ালার বাণী:

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَـٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِى ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَـٰهِدِينَ فَفَهَّمۡنَـٰهَا سُلَيۡمَـٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمًا وَعِلۡمًاۚ

আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত নবীদের দুজনেরই বিচার-বুদ্ধি এবং জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালামের উপলদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

**উল্লেখ্য** এখানে আরেক প্রকারের ইখতেলাফ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তার উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি এক পক্ষের প্রশংসা করেছেন; তারা হলো মুমীন। এবং আরেকটি পক্ষের নিন্দা করেছেন। কোরআনে এসেছে:

تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَـٰتٖۚ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَـٰتِ وَأَيَّدۡنَـٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَـٰتُ وَلَـٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ

আয়াতে "কিন্তু তারা মতপার্থক্য করল। তাদের কেউ ইমান আনল। আর কেউ কুফরি করে বসল।" আল্লাহ দুটি পক্ষের একটা পক্ষের প্রশংসা করলেন। কারণ তারা ইমাণ এনেছে। আর অপর পক্ষের কুফরির কারণে তাদের ভর্তসনা করেছেন।

আরেক প্রকারের ইখতেলাফ আছে। তাকে বলা হয়; **ইখতিলাফুত তানযিল** এবং **ইখতিলাফুত তা'উইল**। ( নাযিলের ব্যাপারে ইখতেলাফ এবং ব্যাখ্যায় ইখতেলাফ।)

ইখতেলাফুত তানযিলের উদাহরণ দিতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিসটি উলে-খ করেন। তিনি বলেন:

سَمِعْتُ رجلًا قرأَ آيةً، قد سَمِعْتُ منَ النَّبيِّ ﷺ خلافَها، فأخذتُهُ، فَجِئْتُ بِهِ إلى النَّبيِّ ﷺ، قالَ: فعَرفتُ في وجهِ النَّبيِّ ﷺ الكراهيةَ، قالَ: كلاكُما محسنٌ ولا تختلفوا، إنَّ من كانَ قبلَكُمُ اختلفوا فأَهْلَكَهُ

অর্থ : আমি এক ব্যক্তিকে কোরআন তেলাওয়াত করতে শুনলাম। রাসূল (স) তার বিপরীত তেলাওয়াত করেছেন। আমি তার হাত ধরে তাকে রাসূলের (স) কাছে নিয়ে আসলাম। আমি রাসূলের চেহারায় বিরক্তি দেখতে পেলাম। তিনি বললেন: তোমাদের দুজনই মুহসিন। তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা। তোমাদের পূব্বের লোকজন মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আর ইখতিলাফুত তা'উইল মানে হলো কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য। উদাহরণ: যেমন (القرأ) শব্দটিকে কেউ মহিলাদের পবিত্র অবস্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার কেউ অপবিত্র অবস্থা তথা হাইয বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

## মতপার্থক্যের ভয়াবহতা

আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারীমে মতপার্থক্য এবং দলাদলির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ

তিনি আরো বলেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ

আরেক জায়গায় তিনি বলেন: وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ

রাসূলও (স) আমাদের ইখওতলাফ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। তার কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো :

- আমর ইবনে শোয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত: তিনি তার বাবা থেকে, তার বাবা তার দাদা( আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস) বর্ণণা করেন : রাসূল (স) এর দরজায় কিছু লোক বসে বিতর্ক করছিল। তাদের একটি অংশ বলছিল : আল্লাহ কি এটা এটা বলেন নাই? অপর অংশ বলছিল: আল্লাহ কি এটা এটা বলেন নাই? রাসূল(স) তাদের কথাগুলো শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। তার মুখমন্ডলে যেন ডালিমের বিচি ফাটিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন: "তোমাদের এ নির্দেশনা কে দিয়েছে? তোমাদের কি কোরআনের এক অংশ দ্বারা অন্য অংশকে আঘাত করতে বলা হয়েছে? এ রকম কাজের কারণে অতীতে বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তোমাদের একাজ অন্তসারশূণ্য। আমি কি আদেশ করেছি? সে দিকে নজর দাও। সে অনুযায়ী কাজ কর। আর আমি যা নিষেধ করেছি সেটা থেকে বিরত থাক।
- রাসূল (স) আরো বলেছেন: ولا تَختلِفوا فتختلفَ قلوبُكم
- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস: ذَرُوني ما تُرِكْتُم فإنَّما هلَكَ الَّذينَ قبْلكم بكثْرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم
- ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: তোমরা মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়োনা। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।
- আরেকটি হাদীসে এসেছে: اقرأوا القرآنَ ما ائتلَفت عليه قلوبُكم، فإذا اختلَفتُم فيه، فَقوموا عَنه

## মতপার্থক্যের কারণ

ইখতেলাফের নানামূখী কারণ রয়েছে। এটার উপর বেশ সংখ্যক কিতাবও রচিত হয়েছে। উল্লেখ করার মত একটি কিতাব হলো "আল ইনসাফ ফি আসবাবিল ইখতেলাফ"। এখানে এ বই থেকে কিছু কারণ উল্লেখ করলাম।

**১. দলীল না পৌঁছা:** এ ব্যাপারটা সব সময়ই ছিল; এমনকি সাহাবীদের যুগেও। সাহাবীদের একটি অংশ নবীর আশেপাশে থাকতেন। আরেকটি অংশের সাথে সাক্ষাত কমই হত। তাছাড়া কোন ঘটনা ঘটার সময় কেউ উপস্থিত থাকতেন, আবার কেউ অনুপস্থিত। এ কারণেই সকল দলীল সব সময় তাদের কাছে পৌছত না। কারো কাছে বেশি পরিমাণে পৌঁছত। কারো কাছে কম পরিমাণে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। আয়েশা এবং উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন: আমরা দেখেছি রমাদানের সময় রাসূল (স) ইহতেলাম ব্যতীত সহবাসের কারণে গোসল ফরয অবস্থায় ফজরের সময়ে উপনীত হতেন। অতপর তিনি গোসল করতেন এবং

সওম পালন করতেন। আবু হুরায়রা (রা) এ হাদীসের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কাছে উপরের হাদীস পৌছার পর তিনি তার ফতোয়া থেকে সরে আসেন। চার ইমামের জীবনে এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে।

**২. দলীল পৌছার পর ভুলে যাওয়া:** কখনো কখনো কোন আলেমের কাছে দলীল পৌছে। কিন্তু তিনি ভুলে যাওয়ার কারণে ভিন্ন ফতোয়া দেন। আর ভুলে যাওয়া মাখলুকের বৈশিষ্ট্য। নবীরাও ভুলে যেতেন। বিষয়টা কোরআন সুন্নাহতে এসেছে।

রাসূল (স) বহুবার উবাই ইবনে কা'ব (রা) প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন : "সে বহু আয়াত আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" উবাই ছাড়া অন্যদের ব্যাপারেও একই ধরণের কথা বলেছেন। তার কথাটি ছিল : " আল্লাহ এই ব্যক্তির উপর রহম করুন; সে আমাকে এই আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমিতো এটা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

এই ভুলে যাওয়াটা সাধারণত সাময়িক হয়। কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র অথবা আপনা আপনি মনে পড়ে। হাদীসে এসেছে, হুজায়ফা (রা) একবার মানুষের মাঝে দোকানে সালাত আদায় করছিলেন। তার সাথে ছিলেন আবু মাসউদ আস-সাকাফী (রা)। তিনি তাকে টেনে ধরে বললেন : "আমাদের কি এটা থেকে নিষেধ করা হয় নায়?" হুজাইফা বলেন : "অবশ্যয়! তুমি দেখনি, জোর করে আমাকে সালাত ছাড়া করার সময় আমি কোন আপত্তি করিনি।" তিনি বুঝতে চেয়েছেন যে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তোমি জোর করার পর মনে পড়ল।

**৩. দলীল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া:** এটা অধিকাংশ মতপার্থক্যের কারণ। যেমন কোন ইমাম বা আলেম একটা হাদীসকে সহীহ বলল। অন্য ইমাম সেটাকে দুর্বল বলল।

প্রাচীন আলেমদের কিতাবে এটার প্রচুর উপস্থিতি দেখা যায়। কখনো এটাও ঘটেছে যে, একজন আলেম কোন হাদীসকে সহীহ হিসেবে পেলেন এবং তার দ্বারা ফতোয়া দিলেন। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন: হাদীসটি যয়িফ। অতপর তিনি তার আগের মত থেকে ফিরে নতুন মত দিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে সে মত সম্পূর্ণ বিপরীতও হয়।

একট উদাহরণ দেখা যাক। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আব্দুল্লাহ ইবনে আকিলের হাদীস (لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب) এর আ'ম অর্থ নিয়ে মৃত জন্তুর কোন কিছু থেকে দাবাগাত করার আগে বা পরে সব ধরণের উপকৃত হওয়াকে অবৈধ মনে করতেন। কিন্তু পরে যখন হাদীসের রাবীদের মাঝে সমস্যা দেখলেন; তিনি সে মত থেকে ফিরে আসলেন এবং ইবনে আব্বাসের হাদীস অনুযায়ি মত দিলেন। এ বহু মাসআলায় এ রকম হয়েছে।

৪. দলীল প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইমাম মনে করছেন এ দলীল দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় : যেমন কোরআনে (..) ব্যবহৃত قرء শব্দটি। আলেমদের একাংশ এটা দ্বারা পবিত্র সময়কে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অন্য অংশ এটাকে হায়েয বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা আগেই যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি : "যে আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ইমান রাখে সে যেন অবশ্যয় বনি কোরায়যায় গিয়ে আসরের নামায আদায় করে।" সাহাবাদের একাংশ মনে করলেন; তিনি ওয়াক্ত হলে সালাত আদায় করবে না। এটা উদ্দেশ্য করেন নায়। বরং দ্রুত বনি কোরায়যায় পৌছার তাগিদ দিয়েছেন। তারা সময় হবার পর সালাত আদায় করেছেন এবং দ্রুত বাকী পথ পাড়ি দিয়েছেন।

অন্য অংশ রাসূলের কথার বাহ্যিক দিকটাকে প্রাধান্য দিলেন। তারা চলতে থাকলেন এবং বনি কোরায়যায় পৌছার আগে সালাত আদায় করেননি। রাসূল (স) তাদের দুপক্ষের কর্মকেই সমর্থন করলেন। কাউকে নিন্দা করেননি।

**৫. আলেমের নিকট দলীল প্রতিষ্ঠিত। তবে তার নিকট আরো বেশি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠিত দলীল আছে। তাই তিনি সে দলীলের দিকে ঝুকে পড়েছেন :**

উদাহরন: (إِنَّما هو بُضعةٌ منك) হাদীসটি সহীহ এবং দলীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার চেয়ে শক্তিশালী দলীল ( من مس ذكره فليتوضأ) উপস্থিত থাকায় আলেমগণের অনেকে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী দলীলটিকে গ্রহন করেছেন।

**৬. গোড়ামী:** এটা কোন মাযহাব, জামায়াত বা শাইখের অনুসারীদের ক্ষেত্রে ঘটে বেশি। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে, ইখতেলাফের প্রধান দুটি কারণ হলো মুর্খতা এবং যুলুম। দ্বিপাক্ষিক এবং নিন্দনীয় মতপার্থক্যের কারণ হতে পারে কখনো অশুদ্ধ নিয়্যত। অশুদ্ধ নিয়্যতের কারণ হল ঔদ্ধত্য,হিংসা কিংবা ফাসাদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে যমিনে প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি। সে অন্যের কথা বা কাজের নিন্দাবাদ করতে ভালবাসে। সে প্রতিপক্ষের উপর প্রধান্য বা বিশেষ কোন মর্যাদা বাগিয়ে নিতে চায়। অথবা নিজের বংশ, মাযহাব বা দেশের লোক অথবা যাদের সাথে বন্ধুত্ব তাদের মতকে ভালবাসে। কারণ তাদের কথা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে বা তার পদ পেতে সাহায্য করবে। আর বনি আদম এ কাজটি হরদম করে থাকে।

**আবার কখনো ইখতেলাফের কারণ হয়:** মতপার্থক্যকারী যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে তার হাকিকত সম্পর্কে সে জানেই না। এমনটাও হয়। অথবা তারা যেটাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করছে তা সম্পর্কেও তার খুব একটা জানাশোনা নেই। অথবা সে তার কাছে থাকা হুকুম এবং দলীলটায় শুধু জানে। কিন্তু প্রতিপক্ষ কি বলছে তার হুকুমও জানে না; দলীলও জানে না।

আর অজ্ঞতা এবং মুর্খতা হলো সকল ক্ষতির মূল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : (وحملها الأنسان أنه كان ظلوما جهولا)

## রাসূলের  যুগে মতপার্থক্যের আদব

যেহেতু বিভিন্ন জনের উপলব্দি বিভিন্ন রকম হয়; আমাদের একটা বিষয়ে নজর দেয়া উচিত। সেটা হল আল্লাহ প্রদত্ত বিবেকের বিভিন্নতা। তিনি মানুষকে নানা রকম বুদ্ধি, বিবেক এবং রুচি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এটাই মতপার্থক্যের পেছনে বড় একটা কারণ। তবে অবশ্যয় মতপার্থক্য শরয়ি কিছু নিয়মনীতির অনুস্মরণ করে হতে হবে। আমরা সাহাবীদের মাঝে বেশ ইখতেলাফ দেখতে পাই। তবে তারা সর্বদা তাদের ইখতেলাফকে আল্লাহ ও রাসূল (স) থেকে দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেখানেই তার সমাধান খুজেছেন। এ কারণে  তাদের মাঝে কোন শত্রুতা, ঘৃণা বা কপটতার জন্ম হয় নি। এখানে নবুয়্যতের যুগে ইখতেলাফের আদব সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১. ইখতেলাফের সময় তাকওয়া এবং সত্যানুসন্ধানের পথ অবলম্বন করা এবং প্রবৃত্তির অনুস্মরণ বর্জন।

২. মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতে আল্লাহ ও রাসূলের (স) কি নির্দেশনা? সেটা দিকে ফিরে যাওয়া।

৩. আল্লাহ ও তার রাসূল প্রদত্ত হুকুমের দিকে ফিরে আসা এবং তার কাছে আত্মসমর্পন।

৪. যখন রাসূল (স) কোন বিষয়ে উভয় পক্ষের মতকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দিতেন, তারা ঐ বিষয়ে নিরব হয়ে যেতেন। মতপার্থক্যের উৎস খুজে একে অপরকে ভর্তসনা করতেন না। যেমন দুই ব্যক্তির মাঝে সালাতের সময় কিবলা কোন দিকে সেটা নিয়ে ইখতেলাফ হলো। অতপর তাদের কাছে স্পষ্ট হলো তারা দুজনই ক্বিবলা ভিন্ন অন্য দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে। তাদের একজন আদায় করে ফেলা সালাতকে যথেষ্ট মনে করল। অন্য জন্য সঠিক ক্বিবলায় পূনরায় সালাত আদায় করল। অতপর তারা যখন নবীর (স) কাছে বিষয়টা পেশ করলো; তিনি প্রথমজনকে বললেন : "তুমি সঠিক সুন্নাহর আমল করেছ। আর দ্বিতীয়জনকে বললেন: তোমার জন্য দ্বিগুন সওয়াব।"

ফলে তাদের মাঝে কোন বৈরিতা বা মনোমালিন্যের পরিবেশ তৈরি হয় নি।

৫. বিতর্কের সময় আলাপচারিতার আদব মেনে চলা এবং কোমল বাক্যের ব্যবহার। অপরপক্ষের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং বিষয়টার সার্বিক দিক মাথায় রেখে যাছাই করে দেখা। আর এ সব কিছুর পেছনেই ছিল নিজেদের দৃশ্যপট থেকে দূরে সরিয়ে কোন না কোন পক্ষের মুখ দিয়ে সত্যটা বের করে নিয়ে আসা।

## সাহাবীদের যুগে মতপার্থক্যের আদব

রাসূলের (সা) তিরোধান এবং সাহাবীদের বিভিন্ন শহেরে ছড়িয়ে পড়ার পর মতপার্থক্যের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়। রাসূলের যুগে যেটা ছিল শুধু মদীনা বা সাহাবীদের নিজস্ব পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু সাহাবীরা (রা) তাদের মতপার্থক্যে সর্বদা জ্ঞানগত মানদন্ডে অটল ছিলেন। এ সময় কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য বা মতদ্বৈততার ঘটনা ঘটে।

**১. রাসূলের (স) ইনতেকাল :** এটা রাসূল (স) এর তিরোধানের পর সংগঠিত প্রথম মতপার্থক্যের ঘটনা। ওমর (রা) তার মৃত্যুর ঘটনাকে অস্বীকার করলেন এবং এটাকে মুনাফিকদের গুজব হিসেবে গণ্য করলেন । কিন্তু আবু বকর (রা) মসজিদের নববীতে উপস্থিত হয়ে হামদ এবং সানা আদায় করে মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ওমর (রা) ও তাদের মাঝে ছিলেন। আবু বকর (রা) বলেন: যে মুহাম্মদের (স) ইবাদত করত তার জন্য বলছি; মুহাম্মদ মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদাত করত সে জেনে রাখো আল্লাহ জীবিত এবং কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি আল্লাহর বানী নিচের আয়াতটি পড়লেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ

إنك ميت وإنهم ميتون

তখন ওমরের (রা) হাত থেকে তরবারি পড়ে যায় এবং তার মাথায় ধরে যে, রাসূল (স) সত্যিই মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি বলেন: আমি যেন এ আয়াতগুলো আগে তেলাওয়াত করিনি। যেন আয়াতগুলো তখনই নাযিল হয়েছে।

**২. তার (স) দাফনের ব্যাপারে মতপার্থক্য:** তার মৃত্যুর ব্যাপারে মতপার্থক্যের পর আসে তার দাফনের ব্যাপারে মতপার্থক্য। কেউ বলছিলেন : তাকে মদীনাবাসীর কবরস্থানে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে দাফন করা হোক। অন্যরা বলছিলেন: তাকে তার মসজিদে দাফন করা হবে। অতপর আবু বকর (রা) সেখানে আসলেন এবং বললেন, তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন: "নবীরা যেখানে মৃত্যু বরণ করেন সেখানেই তাদের দাফন করা হয়।" তার কথার মাধ্যমে মতপার্থক্যের অবসান হয়। আয়েশার (রা) ঘরে যে খাটে তার মৃত্যু হয় তার নিচেই কবর খোড়া হয় এবং দাফন করা হয়।

**৩. রাসূলের পর তার খলিফা নির্ধারণে মতপার্থক্য:** এ সময় সাহাবীরা খলিফা কে হবেন? এ প্রশ্নে মতপার্থক্য করেন। খলিফা কি মুহাজিরদের মধ্য থেকে হবেন না আনসারদের মধ্য থেকে ? ইবনে ইসহাক বলেন: ( )

কিছু বর্ণণায় এসেছে: আনসাররা বনি সায়াদার একটি মিলনকেন্দ্রে জড় হয়। তারা যখন জানতে পারলো আবু বকর এবং ওমর (রা) এ দিকেই আসছেন; একজন আনসার বক্তা দাড়িয়ে গেলেন। তিনি আনসারদের মাহাত্ব বর্ণণা করে বললেন: আনসাররা মুহাহিরদের তুলনায় খিলাফতের অধিক দাবিদার। তার কথা শেষ করার পর ওমর (রা) কথা বলতে চাইলেন। তিনি কিছু কথা বলার প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিলেন। তবে আবু বকর (রা) তার আগেই দাড়িয়ে গেলেন। তিনি আনসারদের প্রশংসা করলেন। তাদের কৃতিত্ব ও অবদানসমূহ বিস্তারিত তুলে ধরলেন। অতপর তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন: খেলাফত যদি কোরায়েশদের হাতে না থাকে তাহলে জাযিরাতুল আরবে ইসলামের প্রভাব যথাযথ থাকবে না এবং আরব ভুখন্ডে ইসলামের বিস্তৃতি বাঁধাগ্রস্থ হবে। তিনি আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলেন: খেলাফত দুজনের কোন একজনের কাছে যাওয়া উচিত। আবু ওবায়দা অথবা ওমর।

একজন আনসারি সাহাবী দাড়িয়ে বললেন: আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং আপনাদের মধ্য থেকে একজন আমির হবেন। তখন উপস্থিত ব্যাক্তিদের মাঝে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। ওমর (রা) বললেন: হে আবু বকর! আপনার হাত প্রসারিত করুন। তিনি আপন হস্ত প্রসারিত করলেন। ওমর (রা) তার হাতে বায়আত নিলেন। তারপর মুহাজিরগন তার হাতে বায়আত নিলেন। অতপর আনসাররাও তার হাতে বায়আত নিলেন। একক সময় তারা বায়আত নেয়ার প্রতিযোগীতায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন। খুবই ভীড়ের সৃষ্টি হয়।

এ ভাবেই সাহাবারা এই জটিল কঠিন ফিতনা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হন। যে বিষয়টিতে কোরআন বা সুন্নাহর কোন নির্দেশনা ছিলনা। বস্তুত তাদের মনে কোন প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ বা ঈর্শা না থকলেও তারা মতপার্থক্যে অতিউৎসাহি হয়ে পড়েছিলেন।

## সাহাবীদের মাঝে কিছু ইখতেলাফের নমূনা :

**১. ওমর ও ইবনে মাসউদ (রা) :** এই দুইজন সাহাবী একশটি বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইউমের (রা) বর্ণণায় বিষয়টা এসেছে।

তারা দুজন যে বিষয়ে ইখতেলাফ করতেন তার একটা হলো, ইবনে মাসউদ  সালাতে দুই হাতকে তাতবীক করার পক্ষে মত পোষণ করতেন। অর্থ্যাৎ রুকুর সময় দুই হাতকে উরুর সাথে মিলানো। তিনি হাটুতে হাত রাখতে নিষেধ করতেন। কিন্তু ওমর এ কাজ করতেন এবং তাতবীক করাকে নিষেধ করতেন।

এ মাসআলায় ওমরের (রা) মতটি সঠিক। ফিকহি বিষয়ে তাদের এই মাসআলাগুলোতে পার্থক্য থাকাটা তাদের পারস্পরিক ভালবাসায় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

একদা ইবনে মাসউদের কাছে দুইজন লোক আসলো। তাদের একজন ওমরের (রা) কাছে কোরআন পড়া শিখছেন। অপরজন শিখেছেন অন্য এক সাহাবীর কাছে। যিনি ওমরের (রা) কাছে কোরআন পড়া শিখেছেন তিনি বললেন: ওমর ইবনে খাত্তাব আমাকে এভাবে শিখিয়েছে। ইবনে মাসউদ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। তার চোখের পানি গড়িয়ে প্রস্তরখন্ড সিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন: ওমর তোমাকে যেভাবে শিখিয়েছে সেভাবেই পড়তে থাকো। তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য এক সুরক্ষিত দুর্গ সরুপ। যাতে মানুষ প্রবেশ করতো। কিন্তু সেটা থেকে বের হতো না। যখন ওমর আক্রান্ত হলো সেই দুর্গ শক্তিহীন হয়ে পড়লো।

একদিন ওমর বসে ছিলেন। ইবনে মাসউদ সে দিকে আসছিলেন। ওমর তাকে আসতে দেখে বললেন: সে কতই না জ্ঞানে পরিপূর্ণ!!

এটাই ছিলো তাদের একজনের ব্যাপারে আরেকজনের মনোভাব। প্রায় একশটি বা তার চেয়ে বেশি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকার পরও তাদের মনোভাব ছিলো সম্মান, মর্যাদা, ভালোবাস এবং বন্ধুত্বের।

আমরা কি আজ আমাদের মতপার্থক্যগুলোতে এই দুজন বিশিষ্ট সাহাবীর পদাঙ্ক অনুস্মরণ করছি? নাকি ভিন্নমত পোষণকারীদের ঘৃণা করছি এবং তাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছি?

**২. আম্মার এবং আয়েশা:** এক ব্যাক্তি আম্মার ইবনে ইয়াসারের উপস্থিতিতে উম্মুল মোমেনীন আয়েশাকে (রা) অসম্মান করছিলো। তিনি উষ্ট্রির যুদ্ধে উম্মুল মোমেনীনের বিপরীত পক্ষে ছিলেন। আম্মার সেই লোককে বললেন: চুপ কর অপদার্থ! তুমি কি রাসূলের (সা) প্রেয়সিকে কষ্ট দিতে চাচ্ছ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি! তিনি জান্নাতেও রাসূলের স্ত্রী। আমাদের মা (রা) তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পথ চলেছেন। কিন্তু আমরা জানি তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতে রাসূলের (স) স্ত্রী। কিন্তু আল্লাহ তাকে দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করেছেন। আমরা আলিকেও (রা) অনুস্মরণ করতে পারি। তাকেও অনুস্মরন করতে পারি।

এই মহান আদবটি সব সময় আমাদের চোখের সামনে রাখা উচিত।

**৩. আম্মার ও ওমর:** অনুরুপভাবে আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং ওমর (রা) এর ঘটনা। তারা কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে তাদের গোসল ফরয হয়। কিন্তু পানি ছিলো না। তারা মাটিতে গড়াগড়ি করেন। ঠিক যেভাবে বিভিন্ প্রাণী মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। এরপর তারা সালাত আদায় করে। অতপর তারা যখন রাসূলের (স) নিকট আগমন করলেন, রাসূল তাদের দুজনকে তায়াম্মুমের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। সেটা হলো মুখ এবং হাত মাসেহ করার জন্যে একবার করে মাটিতে হাত মারা। ওমর এ কথাটি ভুলে যান। আম্মার (রা) ওমরের (রা) খেলাফতকালে একবার সুন্নাহই বর্ণিত তায়াম্মুমের পদ্ধতি নিয়ে ফতোয়া দিচ্ছিলেন। কিন্তু ওমর তার সাথে একমত হচ্ছিলেন না। আম্মার তাকে সেই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি স্মরণ করতে চাইলেন না।

আম্মার বললেন: হে আমিরুল মোমেনিন! আপনি যদি চান যে আমি এ বিষয়ে কোন ফতোয়া দেবো না; তাহলে আমি তা করবো না। ওমর বললেন: না।  আপনি যে দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন আমি আপনাকে সে দায়িত্ব প্রদান করলাম। তিনি তার সাথে কোন কঠোর আচরণ করেন নি। তার মতকে প্রত্যাখ্যানও করেন নি। বরং তার কাছে থাকা জ্ঞানের উপর তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

## ফিতনার সময় ইখতেলাফের আদবঃ

ইমাম বায়হাকি তার সুনানে বর্ণনা করেন: ইমরান ইবনে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ উষ্ট্রীর যুদ্ধের পর আলী ইবনে আবি তালেবের কাছে গেলেন। যুদ্ধটি ছিলো ইমরানের পিতা তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং আলীর (রা) মাঝে। তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তার সাথে উষ্ণ আচরণ করে বলেন: আমি আল্লাহর তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের ব্যাপারে বলা : ونزعنا مافي صدورهم من غل إخونا علي سرور مبقتلين

অতপর তিনি তালহার পরিবারের একজন একজন করে সবার খোঁজখবর নেন। তিনি বাচ্চা এবং মহিলাদের কথাও জিজ্ঞেস করে বলেন: ভাতিজা ওই বৃদ্ধাটির কি অবস্থা? মেয়েটির কি অবস্থা? উপস্থিত যারা মহানবীর উত্তম সহচর্য বঞ্চিত ছিলেন এবং যারা রাসূলের সাহাবীদের মনোস্তত্ব নিয়ে  জ্ঞাত ছিলেন না তাদের বিস্ময়ের শেষ ছিলোনা। একপাশ থেকে দুজন লোক বলে উঠলেন: আল্লাহ কি এতই ন্যায়পরায়ন! গতকাল তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলে; আবার জান্নাতে ভাই ভাই হয়ে একই সাথে থাকবে? আলী (রা) রাগান্বিত হয়ে তাদের বলেন : তোমরা আল্লাহর পৃথিবীতে সবচেয়ে দুরের পথ বেছে নিয়েছো। কে সেই ব্যাক্তি? আমি বা তালহা যদি না হই তাহলে কে?

তাদের কেউ আলী (রা) কে উষ্ট্রীর যুদ্ধের বিরোধীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন : তারা কি মুশরিক? তিনি বলেন : তারা তো শিরক ত্যাগ করে ইসলামে এসেছে। তারা প্রশ্ন করলেন : তাহলে কি মুনাফিক? তিনি বলেন: মুনাফিকরা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে তারা কারা? তিনি বলেন : তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমাদেরই ভাই।

## ইমামদের মাঝে মতপার্থক্যের আদবঃ

**১. আবু হানিফা ও মালেকঃ**

যে এই দুই ইমামের মাযহাবকে পর্যালোচনা করতে যাবে সে দেখতে পাবে, তাদের মাঝে প্রচুর পরিমাণ মতপার্থক্য রয়েছে। এমনকি তাদের মাযহাবের মৌলনীতিতেও মতপার্থক্য রয়েছে। তথাপি তারা দুজনেই অপরকে সম্মান করতেন এবং একে অপরের প্রশংসা করতেন। কাজী ইয়াজ তার আল-মাদারিক এ  বর্ণণা করেছেন; লাইস ইবনে সা'দ বলেন : আমি ইমাম মালেকের সাথে মদীনায় মিলিত হয়েছি। তাকে বলেছি : আমি আপনাকে বার বার কপালের ঘাম মুছতে দেখছি। তিনি জবাব দেন : আবু হানিফা আমার ঘাম বের করে দিয়েছে। তিনি আসলেই একজন ফকীহ হে আমার মিশরী ভাই!

লাইস বলেন : তারপর আমি আবু হানিফার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে বললাম : এই ব্যাক্তি আপনার ব্যাপারে কত সুন্দর কথাই না বললেন! (তিনি ইমাম মালেকের দিকে ইশারা করেছিলেন।) আবু হানিফা বলেন : আমি সঠিক জবাব প্রদান  এবং যথাযোগ্য সমালোচনায় তার চেয়ে অধিক দক্ষ আর কাউকে দেখিনি।

**২. মুহাম্মদ ইবনে হাসান(আবি হানিফার ছাত্র) এবং ইমাম শাফেয়ীঃ**

ইমাম শায়ফেয়ী’ (র) বলেন : আমি এবং মুহাম্মদ ইবনে হাসান একদিন আলোচনা করছিলাম। আমাদের মাঝে অনেক কথাবার্তা ও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলো। এমনকি আমি দেখতে পেলাম তার ঘাড়ের রগ ফুলে ওঠেছে, ঘাড়ের নিচের হাড় ওঠানামা করছে।

মুহাম্মদ ইবনে হাসান বললেন : যদি কোন ব্যক্তি আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং আমাদের বিপরীত মত প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় সে একমাত্র শাফেয়ী’। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো: কারণ কি?

তিনি বলেন: তিনি বাকপটু এবং মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

**৩. মালেক এবং ইবনে উ'য়াইনা :**

ইমাম শাফেয়ী' (র) বলেন : মালেক এবং ইবনে উয়াইনা জুটি! যদি তারা দুজন না থাকতো তবে হিজাজের ইলম হারিয়ে যেতো। বর্ণিত আছে ইবনে উয়াইনা একবার একটি হাদীস বর্ণণা করলেন। তাকে বলা হলো ইমাম মালেক এ হাদীসের ব্যাপারে আপনার সাথে দ্বিমত করেছেন। তিনি ওই কথার কথককে বললেন: তুমি কি আমার চেয়ে মালেকের বেশি কাছের? আমি এবং মালেক হচ্ছি ঠিক জারিরের কবিতার বানীর মতো:

وبن اللبون أذا ما لزفي قرن

لم يستطع صولة البزل القناعيس

তিনি আরো বলেন : তার কাছে সহীহ ছাড়া কোন হাদীস পৌঁছত না। তিনি সিকাহ লোক ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। আনাস ইবনে মালেকের মৃত্যুর পর আমি মদীনার জন্য শুধু ধ্বংসই দেখতে পাচ্ছি।

**৪. মালেক এবং শাফেয়ী :**

ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের ছাত্র ছিলেন। তিনি তখনো ফতোয়া দিতে মনস্থ করেন নি। এক ব্যক্তি ইমাম মালেকের কাছে ফতোয়া জানতে চাইল যে, সে একটি ঘুঘু ক্রয় করেছে। শর্ত ছিলো ঘুঘু সারাক্ষণ ডাকবে। যদি ঘুঘুটি দিনের একটি অংশে ডাকে তাহলে কি হবে? তিনি ফেরত দেবার পক্ষে ফতোয়া দিলেন। প্রশ্নকারী বের হলেন। ইমাম শাফেয়ী তখন মাত্র পনের বছরের বালক। শাফেয়ী তাকে বললেন : ঘুঘু কি দিনের অধিকাংশ সময় ডাকে নাকি অধিকাংশ সময় চুপ থাকে? প্রশ্নকারী বললেন : হুমম। অধিকাংশ সময় ডাকে। তিনি বললেন : তাহলে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। প্রশ্নকারী আবার ইমামের কাছে গেলেন। তাকে বললেন : আমার ব্যাপারটা আবার দেখেন। ইমাম বললেন : আমি যা তোমাকে বলেছি তা ছাড়া কোন কিছু আমার কাছে নেই। সে লোক বললেন : দরজায় আপনার এক ছাত্র আমাকে বললো যে, আমার ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। তিনি বললেন : তাকে নিয়ে আস। লোকটি ইমাম শাফেয়ীকে হাজির করলেন। তিনি তাকে বললেন: তুমি নাকি বলছো সে ঘুঘুটি ফেরত দিতে পারবেনা?

শাফেয়ী বলেন: হ্যাঁ। আমি আপনাকে বলতে শুনেছি (সনদ উল্লেখ পূর্বক) নবী (স) ফাতেমা কারশিয়্যাকে বলেছেন : আবু জাহম তার কাঁধ থেকে লাঠি সরিয়ে নেয় নি। আর মুয়াবিয়া কপর্দক শূণ্য; তার কোন সম্পদ নেই। সুতরাং তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করো।

তিনি বলেন : এখানে কোন বিষয়টা তোমার কথার পক্ষে দলীল হিসেবে আনছো?

শাফেয়ী বলেন : সে তার কাঁধ থেকে লাঠি সরিয়ে নেয়নি মানে সে খুবই ভ্রমন করতো। মানে সে সব সময় ভ্রমনেই থাকতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো তিনি সব সময় নয়, অধিকাংশ সময় ভ্রমণে থাকতেন। আর আমরাও সব সময় ভ্রমণ মনে না করে অধিক ভ্রমণ করা দ্বারাই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি। আরবদের ভাষাও এটা। তাই আমি বলেছি : যদি দিনের অধিকাংশ সময় ডাকে তবে ফেরত দেয়া হবে না। কেননা সেটাকে সব সময় ডাকে বলার সুযোগ আছে।

এ সময় মুসলিম ইবনে খালেদ জঙ্গি (তিনি তার শায়খ) তাকে বলেন : তুমি এখন থেকে ফতোয়া দিতে পারো। কেননা এখন তোমার ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা হয়ে গেছে। ইমাম মালেক একজন ছাত্রের পক্ষ থেকে তার বিপরীতে ফতোয়া প্রদানকে হেয় দৃষ্টিতে দেখেননি। তাকে তিরষ্কারও করেননি। বরং তিনি চুপ থেকে মতটি সমর্থন করেন। আল্লাহ তাদের সবার উপর রহম করুন।

## ইমামদের যুগে ইখতেলাফের কিছু বৈশিষ্ট্য:

ইমামদের মাঝে বহুল পরিমাণে নানমুখী ইখতেলাফ ছিলো; কিন্তু সেটা তাদের মধ্যকার নিবিড় ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসাকে কখনো ঘোলা করতে পারে নি। তারা সকলেই একে অপরের প্রশংসা করেছেন, তাদের ইজতেহাদকে সম্মান করেছেন। তারা শুধু প্রতিপক্ষের মতকে সঠিক বলে গ্রহন করেননি। যেটা ইমাম শাফেয়ী'র কথায় এসেছে : "আমার মত শুদ্ধ তবে ভুল হওয়ার সম্ভবনা রাখে। অন্যদের মত ভুল কিন্তু শুদ্ধ হওয়ার সম্ভবনা রাখে।" আমি এখানে তাদের যুগের মতপার্থক্যের কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন উল্লেখ করতে চাই। আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহম করুন।

১. আল্লাহর সাথে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন এবং মতদ্বৈততার সময় স্বেচ্ছাচারিতা ও মোহ থেকে দূরে থাকা।

২. সত্য বের করে আনার  জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

৩. জ্ঞানের মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে মতপার্থক্য করা।

৪. ভালোবাসা এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করা।

৫. তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসৃত মতপার্থক্যের আদাব সমূহ অনুস্মরণ।

৬. আল্লাহর আদেশ এবং রাসুলের সুন্নাহর  দিকে ফিরে যাওয়া এবং কোন মত স্পষ্ট হলে  সেটা গ্রহন করা এবং সেই মতের দিকে নিজেদের সমর্পন করা।

৭. মতপার্থক্যকারীকে সম্মান করা এবং তার প্রশংসা করা। শুধু তার মতের দিকে আঙ্গুল তোলা।

৮. সতর্কতার সহিত শুদ্ধকে শুদ্ধজ্ঞান করা এবং ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

## নসিহত

সবশেষে আমি আমার জ্ঞানপিপাসু ভাইদের উপদেশ দেবো; তারা যেন যথাযথ পরিশ্রম এবং ইজতেহাদের মাধ্যমে শরিয়াহ অধ্যয়ন করে। আল্লাহর ইচ্ছায় এটা তাদের সত্যের কাছাকাছি পৌছে দেবে। একইভাবে আমি তাদের উপদেশ দেবো তারা যেন নিষ্ফল অকেজো বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। যেটা কোন ফল দেয় না।

আমি আরো উপদেশ দেবো তারা যেন, ঝগড়া-বিরোধীতা থেকে বিরত থাকে। এটা তাদের  আপন ভায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং শত্রুতার দিকে নিয়ে যাবে। তাদের দাড় করিয়ে দেবে সত্য এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয়ের বিপরীতে।

সহীহ হাদীসে এসেছে: "যে সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া এড়িয়ে গেছে; আমি জান্নাতের উপকণ্ঠে তার জন্য একটি বাড়ীর জিম্মাদার। "তিনি আরো বলেন: "সঠিক পথ পাবার পর বহু জাতি শুধু ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

হাসান বছরি থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : "আমরা কোন ফকিহকে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে দেখিনি।"

মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বানী হল : "তোমরা ঝগড়া থেকে বিরত থাক। কেননা এটা আলেমের অজ্ঞতার সময়। এটার মাধ্যমে শয়তান তাকে পদচ্যুত করে ফেলে।"

মুহাম্মদ ইবনে হাসান বলেন :" প্রজ্ঞাবানদের মতে, অতি মতপার্থক্য ভ্রাতৃত্বপূর্ণ হৃদয়কে বদলে ফেলে। মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশে বাড়াবাড়ি/দলাদলির জন্ম দেয়। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশকে কালিমাযুক্ত করে ফেলে।"

**সতর্কতা:**

যদি কোন মাসআলায় ইজতেহাদের সুযোগ থাকে; সেখানে মুজতাহিদ বা মুকাল্লিদ যে ভাবেই যে আমল করুক তাদের নিন্দা করার সুযোগ নেই। তোমাদের সামনে এ ব্যাপারে কিছু আহলুল ইলমের মত/বাক্য উল্লেখ করা হলো :

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন : "যদি তুমি দেখ কোন লোক মতপার্থক্যপূর্ণ কোন বিষয়ে একটি মতের উপর আমল করছে; যেটা তোমার মতের বিপরীত, তাকে সেটা করতে নিষেধ করোনা।" তিনি আরো বলেন: "যে ব্যাপারে ফকীহগণ মতপার্থক্য করেছেন সেখানে আমি আমার ভাইদের কোন একটা গ্রহন করতে নিষেধ করিনা।"

ইমাম নববী বলেন: "মুফতি বা বিচারকের কোন অধিকার নেই তার বিপরীত মত পোষণকারীকে বাঁধা দেয়ার; যতক্ষণ না সে কোন কোরআনের আয়াত, হাদীস, ইজমা বা স্পষ্ট কিয়াসের বিপরীত কিছু না করে।"

ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ বলেন: "ফতোয়া চলমান থাকবে। কেউ হালাল ঘোষণা করবে। কেউ হারাম। হারাম ঘোষণাকারী এটা মনে করবে না যে, মহলটা তার হালাল ঘোষণার কারণে ধ্বংশ হয়েছে। আর হালালকারীও এটা মনে করবে না যে, হারাম ঘোষণার কারণে মহলটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।"

**ইখতেলাফ সংগঠিত হলে যে শিষ্টাচারগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে:**

**১. ইখলাস এবং সত্যের তালাশ :**

প্রাচীন বা পরবর্তী যুগের গ্রহনযোগ্য আলেমদের বইসমূহ থেকে গবেষণা বা অধ্যয়নের সময় অবশ্যয় উদ্দেশ্য থাকতে হবে সত্য বের করে নিয়ে আসা। এ কারণে প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু ছাত্র বা গবেষককে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতার উদ্ধে থাকতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে এটা খুবই সহজ কথা। কিন্তু বাস্তবায়নের সময় ততটায় কঠিন যতটা শুনতে সহজ মনে হয়। বহু মানুষকে দেখা যায় তারা দাবী করে তারা সত্যের (তাত্ত্বিকভাবে) দিকে ডাকছে। কিন্তু বাস্তবে সে আসলে নিজের মতের দিকে ডাকছে । সে তার মত , তার শায়খ , তার মাযহাব, তার জামায়াত বা তার দলকে সমর্থন করছে। সম্ভবত এটা কিছু তালেবে ইলমের সাথে ঘটে । তারা কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে জোরপূর্বক সর্বোত্তম মতের অনুসারী বানাতে গিয়ে এটা করে। তারা অন্যকে পথভ্রষ্ট করে। নিজে ফাসেকীতে লিপ্ত হয়। অবুঝ আচরণ করে বসে। এটার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো তার অনুসারীরাও একই বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করে নিজ মতকেই সমর্থন করতে থাকে।

**২. যতদূর সম্ভব বিতর্ক এড়িয়ে চলা:**

এটার বেশ কিছু দিক রয়েছে। যেমন :

ক. বিপরীত মতের অনুসারীর ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ভ্রাতৃতকে প্রাধান্য দেয়া।

খ. বিপরীত মতের কথাকে উত্তম ব্যাখ্যার মাধ্যমে গ্রহন করা।

গ. যদি এমন কিছু প্রকাশ পায়, যেটাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই সে ব্যাপারে কৈফিয়ত প্রদান করা এবং সে কথা থেকে সরে আসা। সত্যাকাঙ্খী কখনো তার বিপরীত মতের কাছে কৈফিয়ত প্রদান করার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। কারণ সেটাতো সত্যের পক্ষে অন্তর্ভুক্ত হবার ডাক নয়; হঠাৎ ঘটে যাওয়া ভুল । আর কোমল কথার চর্চার মাধ্যমে এটা থেকে সতর্ক হবার সুযোগ আছে।

ঘ. প্রতিপক্ষ যখন তার মতের পক্ষে ফিরে আসতে চায় তাকে উদার চিত্তে গ্রহন করা।

ঙ. ইসলামের সাধারণ আদাবগুলোর অনুস্মরণ । আর এটা সম্ভব সর্বোত্তম শব্দচয়ন এবং কদর্য ও হানিকারক কথা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

চ, সকল মতপার্থক্যকে কিতাব এবং সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং এ দুটো থেকে স্পষ্ট হওয়া হুকুম প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করা।

ছ. কিতাব এবং সুন্নাহ থেকে হুকুম বের করতে সক্ষম না হলে আহলুল ইলমের মতের দিকে ফিরে আসা।

আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনম্র চিত্তে দোয়া করছি, তিনি যেন মুসলমানদের কণ্ঠ সমূহ এক করে দেন। তার কিতাব, রাসূলের (স) সুন্নাহ এবং সালাফদের মানহাজের উপর তাদের কাতারগুলো এক করে দেন। তিনি সব শোনেন। তিনি উপযুক্ত সময়ে জবাব দেন। আমাদের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসার মাধ্যমে শেষ করছি।

পরিশেষে সম্মানিত প্রিয় ভাই আলাউয়ি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-ইজ্জির প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি এ রিসালাহটি সম্পাদনায় সময় দিয়েছেন।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

আবু আব্দুর রহমান আক্বিল আল-মাকরিতি

তাইজ, ইয়ামান